ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্তদার্শনিক যুক্তিসমূহ খন্ডন

অ ন ন্ত

ananta@inbox.com

১১ অক্টোবর, ২০০৬

সুদীর্ঘকাল ধরেই মানুষের চিন্তাজগতে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও পরিণতি সংক্রান্ত কিছু কিছু মৌলিক বিষয়াবলী নিয়ে নানা বিস্ময়, কৌতুহল, জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়েছে। এই বিস্ময়বোধ, কৌতুহল-জিজ্ঞাসার তাগিদেই মানুষ নামক প্রজাতি চালিত হয়ে আসছে অজানাকে জানার, বিশ্ব-মহাবিশ্ব উৎপত্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের, মানব জীবনের বিবিধ রহস্য উদঘাটনের লক্ষ্যে। ছোট্ট একটি পাখি যেমন ডানা মেলে উড়ে যায় দূর থেকে অনেক দূরে, আকাশের মেঘ যেমন পাড়ি দেয় লোক থেকে লোকান্তরে, তেমনি যুগে যুগে কৌতুহলী মানুষ তার শত সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে ব্রতী হয় জ্ঞানানুশীলন আর সত্যানুসন্ধানের দুঃসাধ্য এক দুঃসাহসিক কাজে। এই জ্ঞানানুশীলন, সত্যানুসন্ধানের আন্তরিক প্রচেষ্টা মানব সত্ত্বার এক অলঙ্ঘনীয় আবেদন এবং এই আবেদনে সাড়া দিয়েই যুগে যুগে চার্বাক, কপিল, বৌদ্ধ, যাজ্ঞবাল্ক্য, শঙ্কর, এপিকিউরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল, আল্লাফ আবুল হুজৈল আল-আল্লাফ, নজ্জাম, জাহিজ, মুআম্মর, আবু হাসিম, হেগেল, স্পিনোজো, হেগেল, কান্ট, টমাস হাক্সলি, কার্ল মার্কস, রাসেল প্রমুখ ভাবুক-চিন্তাবিদ-দার্শনিক নির্মাণ করেছেন দর্শনের আঁকাবাঁকা ইতিহাস; এবং এই ইতিহাসের ঐতিহাসিক প্রকৃয়ায় রচিত হয়েছে মানুষের সভ্যতা- সংস্কৃতির সুদীর্ঘ বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য।

আমাদের মানব সভ্যতার মতোই দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কিন্তু এর কোনো সরল সোজা সংজ্ঞা নেই। তবে স্বরূপ লক্ষণ বা সংজ্ঞা নির্ণয় সরাসরি সম্ভব না হলেও দর্শনের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদগ্ধ পন্ডিতজনেরা মোটামুটি একমত। ইংরেজি "**Philosophy**" শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলা ভাষায় "দর্শন " শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। 'দশর্ন' শব্দটির উৎপত্তি 'দৃশ' ধাতু থেকে। দৃশ মানে দেখা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে "দর্শন" বলতে "**কোন কিছুকে চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করা**"কে বুঝায়। কালক্রমে দর্শনের অর্থ আরোও বিস্তৃত হয়, এবং একসময় দর্শন বলতে শুধু চাক্ষুসভাবে দেখাকে না বুঝিয়ে, বুঝানো হয় যুক্তির মাধ্যমে অর্থাৎ বিচার বিশ্লেষণমূলক চিন্তাভাবনা ও আলাপ-আলোচনা'কে। "দর্শন" শব্দটির সঙ্গে স্বজ্ঞার (Intuition) বা বিচার-বুদ্ধির একটি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাই দেখা যায়, উপলব্ধিপ্রসূত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত ও তত্ত্বের বিচার-বিশ্লেষণ অর্থেই দর্শন কথাটির ব্যাপক প্রচলন। অর্থাৎ বলা যায় যে, **কোনরকম পূর্বসংস্কার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে মুক্তবুদ্ধির আলোকে অনুভব, বিশ্বাস ও ধারণার পরীক্ষার-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধান ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার অর্জনই দর্শনের অভীষ্ট লক্ষ্য।** আবার ইংরেজি ভাষায় "ফিলোসফি" (Philosophy) কথাটি উদ্ভুত হয়েছে '**ফিলিন**' (ভালোবাসা) ও '**সোফিয়া**' (প্রজ্ঞা), এ দুটি মূল শব্দ থেকে। ধাতুগত অর্থে ফিলোসফি বলতে বুঝায় জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা/ অনুরাগ/ প্রীতি বা প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা/ অনুরাগ/ প্রীতি। যতদূর জানা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ছ'শতকের গ্রীক মনীষী পিথাগোরাস সর্বপ্রথম "ফিলোসফি" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন এই জ্ঞানপ্রীতি বা প্রজ্ঞানুরাগ অর্থেই। তাঁর মতে জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ তথা সত্যানুসন্ধানের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই ফিলোসফির মূল লক্ষ্য।

এজন্যই **Oxford Dictionary** - তে "**Philosophy**" শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছে এভাবে "**Use of reason and argument in seeking truth and knowledge of reality, esp. knowledge of the causes and nature of the things and of the principles governing existence.**"

তবে দর্শনের আলোচ্য প্রশ্নাবলী বা জ্ঞানগত আলোচনার মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। দর্শন বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ কিংবা তথ্যানুসন্ধানে আগ্রহী নয়। যেমন, আগামীকাল আমরা কি কি করতে পারি, দুপুরে কি কি খাবার গ্রহণ করবো, কোথায় যাব, গাড়ির রং, মডেল কেমন হবে ইত্যাদি এরকম অসংখ্য খুঁটিনাটি প্রশ্ন দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় নয়। দর্শন যেসব প্রশ্ন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সেগুলোর রূপস্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ভিন্নতর। দার্শনিক প্রশ্ন কোনো বিশেষ সময়ের বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বেলায় প্রযোজ্য বিশেষ ধরনের প্রশ্ন নয়, বরং স্থান-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের বেলায় প্রযোজ্য ফান্ডামেন্টাল (Fundamental) বা মৌলিক প্রশ্ন; দার্শনিক প্রশ্ন স্বরূপতই সার্বজনীন, চিরন্তন ও শাশ্বত প্রশ্ন। যেমন- জগতের উৎপত্তি কিভাবে হলো? এর প্রকৃতি বা পরিণতি কী? জগতের স্রষ্টা বা নিয়ন্তা বলে কেউ আছেন কি-না? মানব জীবনের পরম শ্রেয় বা পুরুষার্থ কী? সুখ- দুঃখ-কস্ট, জয়-পরাজয়-পরাভবের অর্থ কী? সদগুণ বা পূণ্য বলতে কী বোঝায়? যথার্থ জ্ঞান ও সত্য বলতে কাকে বলে? ইত্যাদি। এই ধরনের নানা মৌলিক প্রশ্ন দিয়েই শুরু হয়েছিল দর্শনের সূত্রপাত। জগৎ ও জীবনের অপার রহস্য বিস্ময়াপ্লুত করেছিল আদিম কৌতুহলী মানুষকে। আর তাদের এই বিস্ময়বোধ ও কৌতুহল থেকে সূত্রপাত ঘটে দর্শনের এবং এ কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য যৌক্তিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছিল দর্শনের সুদীর্ঘ আঁকাবাঁকা ইতিহাস। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক ফরাসী দার্শনিক ডেকার্ট (১৫৯৬-১৬৫০)-এর মতে "**সুচিন্তিত ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে প্রাথমিক সংশয় অবলম্বন করা এবং এর ভিত্তি হলো জ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ**"। এ থেকে বুঝা যায় দর্শন কথাটি একদিকে যেমন কিছু মতবাদের (Ism), অন্যদিকে তেমনি একটি মনোবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতই একটি **যুক্তিবাদী, সংশয়বাদী, বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গি**।

দর্শন নিয়ে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, **দর্শন একটি মতবাদ, যে মতবাদ কোনরকম পূর্বসংস্কার, ভাবাবেগ, অন্ধবিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত না হয়ে মুক্তবুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানমূলক জ্ঞান আবার এই দর্শন মানুষের মনোবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে যা যুক্তিবাদী, সংশয়বাদী, বিচারশীল দৃষ্টিভঙ্গি।**

দর্শনের বর্তমানে প্রচলিত সংজ্ঞা যা হোক না কেন, আমরা মানব সমাজের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, মানব সভ্যতার বৌদ্ধিক বিকাশের নানা সময়ে মুক্তবুদ্ধির আলোকে, বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠলেও মাঝে মাঝে পূর্ববর্তী সংস্কার-রহস্যময়তা-আপ্তবাক্যে অন্ধবিশ্বাস-আবেগ-জাত্যাভিমান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই নানা দার্শনিক মতবাদ প্রবলভাবেই বিকশিত হয়েছে। তাই প্রশ্ন ওঠে আসে যে, সংস্কারাচ্ছন্ন আপ্তবাক্য কিংবা পবিত্র কিতাব (!) কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দার্শনিক মতবাদগুলো আসলেই কি কোনো দর্শনের সংজ্ঞা বা বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল খায় কি-না?? - এই ধরণের

প্রশ্ন কিংবা বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় **মানব জাতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-আবিস্কার, শ্রম, মেধা, সংশয়বাদীমন, জিজ্ঞাসা যুগে যুগে দার্শনিক মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে।**

আমাদের দর্শন শাস্ত্র সেই ঐতিহাসিক কাল থেকেই মোটামুটিভাবে দুটি মোটাদাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে ভাববাদী বা ধর্মীয় দর্শন এবং অপরটি হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শন। এই ভাববাদী দর্শন এবং বস্তুবাদী দর্শনের নিজেদের মধ্যে নানা বাদ-মতবাদ রয়েছে। তবে সেগুলো আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়।

আগেই বলা হয়েছে, সুদীর্ঘকাল ধরেই অর্থাৎ মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের সময় থেকেই মানুষ এই বিশাল বিশ্ব-মহাবিশ্ব-জগতের সৃষ্টি-স্রষ্টা, উৎপত্তির প্রকৃয়া নিয়ে নানা সময়ে ভেবেছে, এখনও ভেবে চলছে। বলা যায়, এই মৌলিক প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের, জ্ঞান, মনন, চেতনা বিকাশের সূত্রপাত। এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা একজন আছেন- এ বিশ্বাস নানা বুদ্ধিজীবী, শাসক, দার্শনিকসহ আমাদের মতো আপামর সাধারণ মানুষের মনেই বদ্ধমূল। তাঁদের কেউ কেউ স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে শুধুমাত্র সরলবিশ্বাসে মেনে নেন, আবার কেউ কেউ এই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান জ্ঞানতত্ত্বগত আলোচনা কিংবা যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে। (এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে ফেলা ভালো যে, ‘‘প্রমাণ’’ শব্দটি আমরা যুক্তিবিদ্যায় কিংবা দৈনন্দিন জীবনে যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি, সে অর্থে এই ‘‘প্রমাণ’’ শব্দটি ধর্মদর্শন কিংবা ভাববাদী দর্শনে এটি ব্যবহৃত হয় না। যদি কোন মানুষ, যে কোন কারণেই হোক ঈশ্বর কিংবা কোনো অলৌকিক সত্তায় বিশ্বাসের ভাব পোষন করে, তবে সেখানে ‘‘প্রমাণ’’ শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং ব্যক্তির সেই প্রমাণগুলো সেই বিশ্বাসটি দৃঢ়তর হতে সাহায্য করে!) সুদীর্ঘ কাল থেকেই ধর্মীয়দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের ‘প্রমাণ’রূপে সাধারণত তিনটি যুক্তি দেখানো হয়।

এগুলো হলো :-

(১) বিশ্বতাত্ত্বিক প্রমাণ (Cosmological Argument)

(২) উদ্দেশ্যবাদী প্রমাণ (Teleological Argument)

(৩) তত্ত্বা সত্তাবিষয়ক প্রমাণ (Ontological Argument)

আধুনিক যুগে এই সনাতন প্রমাণগুলোর সঙ্গে আরও একটি যোগ করেছেন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট। এই চতুর্থ প্রমাণটি হলো :-

(৪) নৈতিক প্রমাণ (Moral Argument)

এখন এই ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ বা যুক্তিগুলো নিয়ে আলোচনা করে, সাথে সাথে এদের বিপরীতের পাল্টা যুক্তিগুলোও লক্ষ্য করা যাক :-

(১) বিশ্বতাত্ত্বিক প্রমাণ (Cosmological Argument) :

মধ্যপ্রাচ্যের দার্শনিক আল-ফারাবী (৮৭০-৯৫০) এবং পশ্চিমা দার্শনিক টমাস একুইনাস (১২২৪-১২৭৪) এই যুক্তি/ প্রমাণ প্রয়োগের জন্য বিখ্যাত। এই প্রমাণটি ভিত্তি হলো, আমাদের এই প্রদত্ত জগতের প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা ব্যাখ্যা করতে হলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আল-ফারাবী বলেন :" কারণ ব্যতীত কোনো কার্য বা ঘটনার উৎপত্তি সম্ভব নয়। জগতের প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার মূলে যেমন একটি কারণ থাকে, তেমনি জগতের সৃষ্টি ও অস্তিত্বের মূলেও একটি কারণ থাকা চাই। কারণ ব্যতীত কোনো কার্য সম্ভব নয়। তবে কার্য ও কারণের এই অনুক্রম সীমাহীনভাবে চলতে পারে না। আমরা তা ভাবতেও পারি না। আর যা ভাবা যায় না, তা সম্ভবও নয়। সুতরাং কার্যকারণ অনুক্রমের মূলে অবশ্যই একটি অকারণিত কারণ (Uncaused cause) থাকবেই। আর সেই কারণ আল্লাহ্।" প্রায় একই যুক্তি দিয়েছিলেন টমাস একুইনাস। তাঁর মতে, কার্যকারণ অনুক্রম অনুসরণ ক্রতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটি কারণ স্বীকার করতেই হয়, যা নিজে সব কার্যের কারণ, অথচ তার নিজের কোনো কারণ নেই। আর সব কারণের এই আদি কারণ হলেন ঈশ্বর। একুইনাস এবং আল ফারাবী'র বক্তব্যকে আমরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি : " জগতে কার্য-কারণ শৃঙ্খলের অস্তিত্ব রয়েছে। কার্য-কারণ তত্ত্ব অনুসারে, কার্য মাত্রেই কারণ-সাপেক্ষ। কার্যবিহীন কারণ বলে কিছু হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কার্য হচ্ছে এমন কোনো ঘটনা, যা তার পূর্ববর্তী কোন ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট; কিন্তু এই পূর্ববর্তী দ্বিতীয় ঘটনাটি আবার তৃতীয় আর একটি ঘটনা দ্বারা উৎপন্ন হবে এবং এইভাবেই ব্যাপারটি অনন্তকাল ধরে চলবে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তুযেহেতু কার্যকারণ শৃঙ্খলের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, মানবচিন্তনকে সন্তুষ্ট করতে পারে না, তাই মানুষ এই অনাদি-অনন্ত কার্য-কারণ পরম্পরার আদি জনকরূপে এমন কোনো একটি কারণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়, যা নিজে আর অপর কোনো কারণের কার্য নয়। এই আদি কারণ অন্যান্য সমস্ত কারণ থেকে পৃথক এবং তা স্বয়ম্ভু বা আত্মসৃষ্ট। আবার যেহেতু ঈশ্বর ছাড়া জগতের অন্য কিছুই স্বয়ম্ভু নয়, অতএব, এই আত্মনির্ভর-স্বয়ম্ভু আদি কারণই হলেন ঈশ্বর এবং জাগতিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যাকর্তারূপে তাঁকে মেনে নিতে আমরা বাধ্য।"

আল ফারাবী প্রদত্ত অপর যে বক্তব্যের সঙ্গে টমাস একুইনাসের বক্তব্যের মিল রয়েছে সেটি প্রতিষ্ঠিত আবশ্যিক (Necessary) সত্তা ও শর্তাধীন (Contingent) বা সাপেক্ষ সত্তার পার্থক্যের উপর। এখানে আবশ্যিক সত্তা বলতে বুঝায় এমন এক সত্তাকে যা নিঃশর্ত ও অনিবার্যভাবে বিদ্যমান, যা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো সত্তার উপর নির্ভর করে না এবং যার অনস্তিত্বচিন্তা করা যায় না। এবং শর্তাধীন বা সাপেক্ষ সত্তা বলতে বুঝায় এমন সত্তাকে যা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোনো সত্তার উপর নির্ভরশীল এবং যার অনস্তিত্বের কথা ভাবা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ জগৎ কোনোদিন না-ও থাকতে পারতো, কিংবা ভবিষ্যতেও না থাকতে পারে, এমন কথা ভাবা অসম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে জগৎ আছে এবং তার এই অস্তিত্ব নির্ভরশীল অন্যকোন সত্তার উপর, তার নিজের উপর নয়। জগতের কারণ সেই সত্তা নিজেও এভাবে অন্য কোনো সত্তার উপর নির্ভরশীল হতে পারে .....এভাবে এক সত্তা অন্য সত্তার উপর নির্ভরশীল। তবে এক সত্তা অন্য সত্তার উপর নির্ভরশীলতার যে অনুক্রম তা সীমাহীনভাবে চলতে পারে না, তাই আমাদের ভাবতে হয় এক নিঃশর্ত, অনুপেক্ষ ও আবশ্যিক সত্তার কথা যার অনস্তিত্ব অসম্ভব এবং যার

অস্তিত্বের প্রমাণ নিহিত থাকে তার ধারণা-ভাবনার মধ্যেই। প্রাণ, জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, ইচ্ছা, শক্তি, সৌন্দর্য প্রভৃতি গুণের আধার এই স্বয়ং অস্তিত্বশীল অনিবার্য সত্তাই হলেন আল্লাহ্ বা ঈশ্বর। পূর্বের মতো এই বক্তব্যকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে - " এই জগৎ সসীম, সাপেক্ষ ও পরনির্ভর বলে এর কোনো ঘটনারই কোনো পূর্বস্বীকার্য অনিবার্যতা নেই। আমাদের এই বাস্তব জগতের কোনো যুক্তিগত অনিবার্যতা না থাকায়, তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য দরকার এমন কোনো সত্তা, যার অনিবার্যতা আছে; কারণ, তা না হলে আমাদের সৃষ্টি-স্রষ্টামূলক চিন্তায় অনবস্থা দোষ (Infinite regress) ঘটবে ....। এই অনিবার্যতা কেবল এমন কোনো সত্তারই থাকা সম্ভব, যা নিজে নিত্যতা সম্পন্ন এবং সমস্ত অনিবার্য সত্যের ভিত্তি স্বরূপ। কিন্তু নিত্যতাসম্পন্ন সত্তা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না। অতএব, এই অনিত্য, অননিবার্য জগতের ব্যাখ্যাকর্তারূপে এক অনাদি-স্বয়ম্ভু ঈশ্বর থাকতে বাধ্য!"

বিশ্বতাত্ত্বিক প্রমাণ/ যুক্তি/ বক্তব্যসমূহ খন্ডন :

(১) ধর্মীয় দর্শনে ঈশ্বরের অনিবার্যতা হলো সত্তাগত অনিবার্যতা কিন্তু এই প্রমাণ বা যুক্তি বড় জোর ঈশ্বরের একধরনের কারণগত অনিবার্যতা দিতে পেরেছে, তার বেশি নয়।

(২) " **কার্য-কারণ প্রত্যয়ের সাহায্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের একটি অসুবিধা হচ্ছে এতে অসীম ঈশ্বরের অসীমতা ক্ষুণ্ন হয়।**" বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করা যাক - কার্য-কারণ প্রত্যয়ে কার্যই যে শুধুমাত্র কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা নয়, কারণও কার্য দ্বারা একইভাবে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ধর্মীয় দর্শন বলে, এই বিশ্ব-মহাবিশ্ব-জগৎ-জীব অর্থাৎ যাবতীয় সবসৃষ্টি অনাদি, অসীম ঈশ্বর-আল্লাহ্-স্রষ্টা'র উপর নির্ভশীল বটে, কিন্তুঈশ্বর-আল্লাহ্ তাদের উপর নির্ভরশীল নন; তিনিই একমাত্র সম্পূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কার্য-কারণ প্রত্যয় দ্বারা জেহোভা, ভগবান, ঈশ্বর, আল্লাহ্ইত্যাদি নামের এক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা স্ববিরোধী প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়ে যাচ্ছে।

(৩) আমাদের এই পৃথিবীতে বিশ্বব্রহ্মান্ডে কার্য যেমন অসংখ্য তেমনি তাদের কারণও অসংখ্য। এই অসংখ্যও পৃথক পৃথক কার্য-কারণের শৃঙ্খল যে, মাত্র একটি আদি কারণ হতেই উৎপন্ন ও তাতেই পরিণতি লাভ করে, তা মেনে নেওয়া যায় কি? তার থেকে কী বলা যায় না, যতগুলো কার্য-কারণ শৃঙ্খল ঠিক ততগুলো আদিকারণ থাকতে বাধা কোথায়? এ প্রসঙ্গে **The Philosophy of Religion (1936 reprint; T. & T. Clark, Edinburgh; International Theological Library Series; Page- 388)** থেকে লেখক **George Galloway** এর একটি উক্তি উল্লেখ করছি : " **.....The Causal series in the world are manifold and it is not legitimate to assume that all lines converge upon and end in a first cause, why not a plurality of first causes?**" এবং তাই যদি হয়, তবে এই প্রমাণের দ্বারা তো একেশ্বরবাদ বা একজন স্রষ্টা-ঈশ্বর' এর অস্তিত্ব প্রমাণিত না হয়ে বরং বহুদেববাদ বা বহু ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়!! কিন্তু একেশ্বরবাদী ধর্মীয় দর্শন গুলো বহুঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনোই স্বীকার করে না। আর ধর্মীয় বিবর্তনের ধারায় বহুদেববাদ একটি নিম্নতরস্তরভুক্ত একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস মাত্র।

(৪) যে যুক্তিতে কার্য-কারণের আদি-অন্তহীন প্রবাহকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে একটি আদি কারণ ঈশ্বরের কল্পনা করা হয়েছে, অথচ সেই আদি কারণ ঈশ্বরের কোনো কারণ নেই- এ দাবির যুক্তিযুক্ততাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্নভাবে। পশ্চিমা দার্শনিক ডেভিড হিউমসহ আরো কয়েকজন প্রশ্ন তুলেছেন : আদি কারণের কারণ কী? যদি প্রত্যেক ঘটনার কারণ থাকতে পারে, তাহলে আমরা শুধুমাত্র ঈশ্বরে গিয়ে আমরা থেমে যাব এবং তখন কার্য-কারণ প্রত্যয় নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করবো, কেন? আদি কারণ হিসেবে ঈশ্বরকে যদি স্বকারণিত কারণ বলে স্বীকার করা যায়, তাহলে একই যুক্তিতে বিশ্ব-মহাবিশ্বকে স্বকারণিত বলে ভাবতে বাধা কোথায়? ঈশ্বর-আল্লাহ্-ভগবান-স্রষ্টা যদি অনন্ত, অনাদি ও শাশ্বত হতে পারে, তাহলে একইভাবে এই বিশ্বজগত অনন্ত, অনাদি ও শাশ্বত হতে পারবে না কেন?

(৫) আবার কার্য-কারণের আদি অন্তহীন প্রবাহকে অতর্কিতে স্তব্ধ করে একটি আদি কারণ কল্পনা করা হয়েছে, তাও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ - আদিকারণটি অবশ্যই কার্য-কারণ শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে অথবা হতে হবে তার বহির্ভূত। যদি প্রথমটি হয়, তবে কেন, আরোও আদি কারণ থাকবে না, তা বোঝা যায় না; কিন্তু যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে আদি কারণের সাথে জাগতিক কার্য-কারণ শৃঙ্খলের কোনো সম্পর্ক না থাকার ফলে, কিভাবে প্রথম সেই আদি কারণ (যাকে ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান বলা হচ্ছে) থেকে জগতের কার্য-কারণ শৃঙ্খল প্রকৃয়ার উৎপত্তি হবে, তাও বোঝা কঠিন।

(৬) আবার বিতর্কের খাতিরে আদি কারণের ধারণা'কে মেনে নিলেও সেই কারণ যে ঈশ্বর'কেই হতে হবে, এমন কথা নিশ্চিত করে বলবো কি করে? যেমন গ্রীক পরমাণুবাদী দার্শণিক অনেক আগেই প্রশ্ন করেছিলেন : ''জড়, শক্তি ও দেশ (**Space**) কি আদি কারণ হতে পারে না? পৃথিবীর আদি কারণ যে এক ও অদ্বিতীয় হবেই হবে, এ নিশ্চিত ঘোষনা দেবো কিসের ভিত্তিতে? এমনতো হতে পারে, আসলে আদি কারণ একটি নয়, একাধিক।'' আবার এও বলা যায়, জগতের প্রত্যেক জিনিসেরই একটা কারণ আছে, এবং সেই কারণেরও একটা কারণ আছে। তাই যদি হয়, তবে কার্য-কারণের ধারা অবিরাম ও অনির্দিষ্টভাবে চলতেই থাকবে, যার ফলে কখনো আদি কারণে বিশ্বাসের প্রশ্নই উঠবে না।

(৭) বিশ্বতাত্ত্বিক প্রমাণে বলা হয়েছে, আমাদের জাগতিক ঘটনার বস্তুগত অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু যুক্তিগত অনিবার্যতা নেই। এই বক্তব্যটিও বিতর্কমূলক। কারণ- যুক্তিগত অনিবার্যতা না থাকলে তো ধর্মীয় দার্শনিকগণের ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে জন্য ''কার্য-কারণ'' নামক যুক্তিবিদ্যার সিদ্ধান্তগ্রহণের মৌলিক প্রত্যয়টি নিয়ে আসার কথা নয়? কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া যায় বক্তব্যটি সত্য, তবে এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় না, জাগতিক ঘটনার সমষ্টিরূপে যে সমগ্র জগৎ, তারও কোনো যুক্তিগত অনিবার্যতা নেই। কারণ তাহলে সেই সিদ্ধান্তটি সামষ্টিকতাজনিত দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে। আবার ব্যষ্টিগত অর্থে কোনো কিছু সত্য হলেই, ধরে নেয়া যায় না যে, তা সমষ্টিগত অর্থেও সত্য হবে। তা ধরে নিলেই যুক্তি হয়ে পড়ে সামষ্টিকতা-দোষে দুষ্ট।

.....ক্রমশ.....